২.৪। পূর্বরাগ : সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাজন, রসতত্ত্ব

২.৪.১। পূর্বরাগের সংজ্ঞা।।

পদাবলী সাহিত্যের রাধা ও কৃষ্ণের অপার্থিব বৃন্দাবনলীলাকে যে কয়েকটি রস পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয় 'পূর্বরাগ' তাদের মধ্যে প্রথম স্তর। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে পূর্বরাগের সংজ্ঞায় শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছিলেন—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।।[১]

—মিলনের পূর্বে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা জাগ্রত যে রতি বা প্রেম নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে, তাকেই বিদগ্ধজন 'পূর্বরাগ' বলেন।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে চারটি ক্রমপর্যায়ে দেখা হয়। যথা পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, করুণ। 'পূর্বরাগ' সম্পর্কে আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখেছেন—

শ্রবণাদর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংবৃঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্বরাগঃ উচ্যতে।।[২]

পূর্বরাগ হল প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ। এই পূর্বরাগে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রতি এত আবিষ্টচিত্ত হয় যে, একে অপরের নাম শ্রবণে মুগ্ধ এবং একে অন্যকে কাছে পাওয়ার অভিলাষে উদগ্রীব। 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

'দর্শন' 'শ্রবণ' আদি সঙ্গমের পূর্বে।
দোহার রতি 'পূর্বরাগ' কহে কবি সর্ব।।[৩]

পূর্বরাগের অনুভূতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরহের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং পূর্বরাগের নায়িকার মধ্যে বিরহের দশটি দশা দেখা যায়; যার শুরু লালসা দিয়ে এবং পরিণতি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব দর্শনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

লালসাদ্বেগজাগর্য্যাস্তনবং জড়িনাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ।।[৪]

—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশটি দশা পূর্বরাগে লক্ষণীয়।

বস্তুত, পরস্পর শ্রবণ ও দর্শন থেকে যে গভীর কৃষ্ণপ্রেম অনুভূতি সঞ্জাত ভাব বা 'রাগ' নায়ক ও নায়িকার অপ্রাপ্তিজনিত দশাবিশেষকেই চিহ্নিত করে, তারই নাম 'পূর্বরাগ'। ড.ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন, 'সংস্কৃত সাহিত্যে কুমারসম্ভবে হরপার্বতীর প্রণয়ে পার্বতীর পূর্বরাগ উদ্ভূত হয়েছিল তার জন্ম থেকেই। 'নলদময়ন্তী' মহাকাব্যের দময়ন্তী কর্তৃক নলের গুণ শ্রবণের পর কিংবা শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ক্ষেত্রে পরস্পরের সন্দর্শনের পর পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছিল। 'রত্নাবলী' প্রভৃতিতেও তাই।'[৫]

Scanned with CamScanner

শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য এই চতুর্বিধা রতি পরিপূর্ণতা লাভ করে মধুর রসের মধ্যে। অনুরূপে মহাভাব স্বরূপিণীতেই সমস্ত ভাবের মুক্তি ঘটে। যিনি এই মহাভাবের অধিশ্বরী তাকে বলা হয় 'প্রৌঢ়বতি'। শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেয়সীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তাই তাঁর প্রেম সর্বধর্ম-কর্ম অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারে। আমাদের প্রেম 'রাগানুগা' প্রেম আর শ্রীরাধার প্রেম 'রাগাত্মিকা' প্রেম। এই প্রেমে কামনা-বাসনা, প্রাপ্তি-প্রত্যাশা থাকে না।

পদাবলী সাহিত্যে পূর্বরাগে 'সমর্থা রতি'র প্রকাশ। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে 'মধুর রতি' তিন প্রকার—

ক।। সাধারণী—ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রেম।
খ।। সমঞ্জসা—সত্যভামা, কুব্জার কৃষ্ণপ্রেম।
গ।। সমর্থা—শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণপ্রেম।

'রসকল্পবল্লী'-তে পূর্বরাগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ'। ইংরেজিতে একেই বলা হয়েছে 'Love at first sight'। 'রসকল্পবল্লী'তে তিনপ্রকার দর্শন (সাক্ষাতে, চিত্রপটে, স্বপ্নে) এবং পাঁচ প্রকার শ্রবণের (সখী, দূতী, ভাট, গুণীজন, বংশীধ্বনি) কথা ব্যক্ত হয়েছে।

২.৪.২। পূর্বরাগের শ্রেণিবিভাগ।।

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বরাগকে দুটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন এবং এই পর্ব দুটির অন্তর্গত উপপর্বকেও তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশিত বিভাজন পদ্ধতি এমন—

১। দর্শনজাত পূর্বরাগ
- ১.১। যমুনা বিপিনে সাক্ষাৎ দর্শন
- ১.২। সখী প্রদত্ত চিত্রপটে দর্শন
- ১.৩। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নদর্শন

২। শ্রবণজাত পূর্বরাগ
- ২.১। বন্দিমুখে বন্দনাগান শ্রবণ
- ২.২। দূতিমুখে অসম্ভব-সম্ভাবপর কাহিনি শ্রবণ
- ২.৩। সখীমুখে প্রেমকথা শ্রবণ
- ২.৪। গুণীজনের কাছে গুণকথা শ্রবণ
- ২.৫। মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ

২.৪.৩। পূর্বরাগের রসতত্ত্ব।।

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'পূর্বরাগ প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ ভেদে ত্রিবিধ। সমর্থারতির স্বরূপকে প্রৌঢ় পূর্বরাগ, সমঞ্জসা রতির স্বরূপকে সামঞ্জস পূর্বরাগ এবং সাধারণ-প্রায় রতিকে সাধারণ পূর্বরাগ বলে।'[৬] প্রৌঢ় পূর্বরাগে দশটি সঞ্চারী ভাব রয়েছে। যথা—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব (কৃশতা), জড়িমা, বৈয়গ্র্য (ব্যগ্রতা), ব্যাধি, উন্মাদ,

Scanned with CamScanner

মোহ এবং মৃত্যুর (মৃত্যু বাসনা) মধ্যে দিয়ে এই পূর্বরাগ 'দশা'রূপ লাভ করে। অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৈষ্ণব পদসংকলন' গ্রন্থে রসশাস্ত্র সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যে পূর্বরাগের অবস্থা নির্দেশ করে তিনি পূর্বরাগকে চিহ্নিত করেছেন 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ' নামে। তিনি লিখেছেন, 'লৌকিক নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে রতিভাব তারই রসরূপের নাম হল শৃঙ্গার। লৌকিকে যাকে শৃঙ্গাররস বলা হয়, বৈষ্ণব ভক্তিতে তারই দিব্যস্বরূপ হল উজ্জ্বলমধুর রস। এই মধুর বা উজ্জ্বল রসই বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ভক্তিরস। দিব্য কৃষ্ণরতিকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কৃষ্ণপ্রেমের মূল যেখানে নায়িকার আত্মসুখ-সম্ভোগেচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থময়, সেক্ষেত্রে তা সাধারণী রতি। যথা কুব্জার কৃষ্ণপ্রেম। কুব্জা কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন আসঙ্গলিপ্সার বশবর্তী হয়ে। স্বকীয়া-প্রেমে যেখানে কৃষ্ণ ও মহিষীদের পারস্পরিক সুখ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা সমানুপাতিক সেক্ষেত্রে তা হল সমঞ্জসা রতি। যথা রুক্মিণী প্রমুখের কৃষ্ণপ্রেম। পরকীয়া প্রেমে ব্রজগোপীদের নিঃশেষে আত্মসুখসম্পর্কহীন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-সর্বস্ব প্রেমই সমর্থা রতি।'[৭]

শ্রীরাধাকে 'মহাভাব-স্বরূপিণী' বলা হয়ে থাকে। এই সমর্থা রতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞান খুঁজে পান এবং এই প্রেমের ঋণ তিনি জন্মজন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পারেন না। সমর্থা রতির ক্রমবিকাশের কয়েকটি সিঁড়ি বা ধাপ রয়েছে। এগুলির পরম্পরা এমন—প্রথমে 'প্রেম', প্রেম থেকে 'স্নেহ', স্নেহ থেকে 'মান', মান দ্রবীভূত হলে তবে 'প্রণয়', প্রণয়ের উৎকর্ষ ঘটলে তাকে 'রাগ' বলা হয় এবং রাগ নিত্য নবায়মান হলে তাকে 'অনুরাগ' বলে। অনুরাগ আত্মগত হলে তাকে বলে 'ভাব' এবং ভাব প্রগাঢ় রূপ পেলে তাকে বলে 'মহাভাব'। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখেছেন—

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।।[৮]

শ্রীরাধা হলেন স্বরূপ শক্তির সারভূতা হ্লাদিনী শক্তি। তিনি শুধু প্রেমরূপিণী নন, তিনি প্রেমদাত্রী। জীব তাঁর প্রেমের অংশমাত্র কৃপাস্বরূপ লাভ করলে ধন্য হয়ে ওঠেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখেছেন—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।[৯]

সমঞ্জসা রতির নায়িকাদের প্রেম 'স্বকীয়া' প্রেম। আর সমর্থা রতির গোপীপ্রেম হল পরকীয়া। গোপ নারীদের মধ্যে যারা এই পরকীয়া প্রেমে কৃষ্ণসুখ-সান্নিধ্য প্রত্যাশা করেছিলেন তাদের তিনটি শ্রেণি রয়েছে। যথা—সাধনপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়া। নিত্যপ্রিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা।

উৎসের সন্ধানে :

১। হরিদাস সেন সম্পাদিত : শ্রীপাদ-শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি', মাঘ ১৪১৪, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ৪৪৯।

Scanned with CamScanner